দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রবন্ধের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বৈচিত্র্যের প্রেক্ষিতে : অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধের শ্রেণী বিভাগ

''পৃথিবীর যখন দেড়শত কোটি বৎসর এমন সময়ে নাকি তাহার কারখানা ঘরে কোথা হইতে জন্মিল প্রাণ। সেই প্রাণের মহানাটক অগ্রসর হইতেই জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল আবার মন।''[১] আর এই মন বা মননই মানুষকে পশু ধর্ম থেকে উদ্ধার করে ঊর্ধ্বতর চেতনায় নিয়ে যায়। এটাই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— ''মস্তিষ্ক কোটরবাসী চিন্তাকীট রাশি রাশি।''[২] আবার এই মনন, চিন্তন, চেতনাকে ধরে রাখার সামর্থ্য একমাত্র মানুষের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। আর সেই চেতনার দুটি দিক যদি জ্ঞানলোক ও রসলোক হয়, তাহলে সাহিত্যকেও স্থূলভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতেই পারে। একটি ভাবের সাহিত্য বা রসসাহিত্য যেখানে স্রষ্টাই মূল, অপরটি জ্ঞানের সাহিত্য সেখানে বিষয়ই মুখ্য। অর্থাৎ উপন্যাস, গল্প ও নানা শ্রেণীর যে রস সাহিত্যগুলি রয়েছে, সেগুলির প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু পাঠককে আনন্দ দান করা মাত্র। কেননা, রস সাহিত্য মানসিক বিবর্তনকে যথাযথ ভাবে ফোটাতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন হয় জ্ঞানের সাহিত্য, যা গদ্যে রচিত প্রবন্ধ নিবন্ধেই ধরা পড়ে। কারণ গদ্য হল যুক্তি ও সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার ভাষা। তাই বলা যায় প্রবন্ধ না হলে মনে হয় মানুষের চিন্তার নৈরাজ্য ঘুচত না। একটা ভাষা, জাতি ও সাহিত্য সাবালক হওয়ার পেছনে প্রবন্ধের ভূমিকাই মুখ্য। দর্শন, তত্ত্ব কথা, সাহিত্য-সংক্রান্ত যাবতীয় চিন্তাপ্রণালী এক কথায় মানসিক বিবর্তন গদ্য রীতিকেই অবলম্বন করে গড়ে উঠে। ''শিল্প, বিজ্ঞান বা দর্শন, যাই হোক না কেন, যে ধরনের চিন্তাই হোক না কেন, তাকে ধরে রাখবার— অন্যের কাছে বা উত্তর পুরুষের কাছে পৌঁছে দেবার বাসনাও মানুষের প্রাগৈতিহাসিক মনস্তত্ত্ব। মনের এই স্বাভাবিক প্রবণতা থেকেই মনে হয় যাবতীয় শিল্পের জন্ম। চিত্র-ভাস্কর্য-সংগীত সাহিত্য সব কিছুর মধ্যেই সেই চিন্তা ধরে রাখবার এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দেবারই প্রয়াস। তবে চিত্র-ভাস্কর্য-সংগীত-নৃত্য প্রভৃতি শিল্পের অন্যান্য শাখার ক্ষেত্রে উপকরণ একাধিক। যেমন— রং, তুলি, পাথর, মাটি, সুর বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। এবং সেক্ষেত্রে স্পষ্টতার তুলনায় আভাস-ইঙ্গিতের প্রয়োগ বেশি। কালের বিবর্তনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেই আভাষ ইঙ্গিতও ক্রমশ জটিলতর হয়ে উঠেছে। তুলনায় সাহিত্যের উপকরণ শুধুমাত্র বর্ণ-শব্দ-বাক্য। তবে সাহিত্যের অন্যান্য শাখাও বর্ণ-শব্দ-বাক্য নিয়ে রচিত হলেও সেগুলি আবার স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে প্রকাশ ভঙ্গির তারতম্যে।''[৩]

উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক প্রভৃতি সাহিত্য শিল্পের মতো প্রবন্ধে পাঠক সাধারণের সাথে

লেখকের কোনরূপ স্থূল বা সূক্ষ্ম আবরণ রক্ষা করা হয় না। বরং প্রবন্ধে লেখক পাঠকের সাথে সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ ভাবে বা অনাবৃত হয়ে নিজস্ব ভাব বা যে কোন জ্ঞানগর্ভ বিষয় স্বচ্ছন্দ বা সহজে প্রকাশ করতে পারেন। আবার গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে স্রষ্টা সরাসরি যুক্ত থাকলেও প্রকাশ ভঙ্গিতে যেখানে আভাস ইঙ্গিতের কারণে তা সহজ হয়ে ওঠে না। তাই বলা যায়, প্রবন্ধের সঙ্গে স্রষ্টার প্রত্যক্ষতা অনেক বেশি। আসলে প্রবন্ধের বিষয় যাই হোক, প্রকাশ ভঙ্গির যুক্তিনিষ্ঠাতাই প্রবন্ধকে বিজ্ঞান মনস্কতার দিকে নিয়ে যায়। আবার বিষয়ের দিক থেকে ভাবলে বলা যায়— ''চিন্তন-মননের একটি অন্যদিক— বিষয়, যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়; অথবা তার উল্টো দিক— ক্রমাগত পরীক্ষা নিরীক্ষা যখন মননকে পুষ্টি দান করে, তখন তা যেভাবেই প্রকাশিত হোক তা তো প্রবন্ধই; তা সে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির নোটবই-ই হোক আর স্টিফেন হকিংয়ের ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম-ই হোক! আর্যভট্ট বা ভাস্করাচার্যের গাণিতিকতত্ত্বই হোক আর ভরতের নাট্যশাস্ত্রই হোক! অর্থাৎ সভ্যতা সংস্কৃতির যাবতীয় দিকই হতে পারে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।''[৪] যদি মন-মননের প্রত্যয় দ্বারা যথাযথ ভাবে চিহ্নিত এবং তাঁর রসবোধে জারিত হয়। শুধু তাই নয়, গুরু গম্ভীর কিংবা হালকা পরিহাস মণ্ডিত গভীর ভাবোদ্দীপক কিংবা নিছক বস্তুগত কোনো বিষয় সার্বজনীন প্রসঙ্গ বা সমস্যা কিংবা ব্যক্তিগত অভিনিবেশ, যে কোনো কিছুই প্রবন্ধের বিষয় হয়ে উঠতে পারে, লেখকের ব্যক্তিত্বের পরশ পাথরের ছোঁয়ায়। আসলে মূল বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, মনে হয় প্রবন্ধকারের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির ও প্রকাশভঙ্গিই তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়ে থাকে। কিন্তু এই প্রবন্ধের উৎস ঠিক কোন সময় থেকে। প্রবন্ধের মাধ্যম যদি গদ্য হয় এবং সেই গদ্য যদি মানসিক বিবর্তনকেই যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তোলে, তারই উৎস বা কোথায়। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের *পুনশ্চ* এর কথা—

''পদ্য হল সমুদ্র
সাহিত্যের আদি যুগের সৃষ্টি।
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে,
কল কল্লোলে!''[৫]

অর্থাৎ চর্যাপদ থেকে প্রাক্-রামমোহন রায় পর্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তর জুড়ে পদ্য, ছন্দ আর কল-কল্লোলের ইতিহাস স্থির হয়ে থাকেনি। যুগের প্রয়োজন ও বিষয়ের বিস্তৃতিই ধীরে ধীরে নিয়ে আসে গদ্য—

''গদ্য এল অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
সুশ্রী-কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল—
ঠেলাঠেলি করে।''[৬]— পয়ারের বন্ধন ছিন্ন করে এল গদ্য। কবিসত্তা বেরিয়ে এল গদ্যের

বিচরণ ভূমিতে। স্নাত হল— গদ্য সলিলে। কথ্য দিনের ভাষা গদ্যকে আশ্রয় করে দৈনন্দিন জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাল-মন্দ, স্ব-প্রকাশ ব্যাকুল হয়ে উঠল। প্রয়োজন সিদ্ধিতে দেখা দিল বিদেশী উদ্যোগ, স্থাপিত হল পর্তুগীজ মিশন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।

এবার আমরা দেখবো কীভাবে পয়ারের বন্ধন ছিন্ন করে বাঁধা ছন্দের বাইরে পদ্য থেকে গদ্যের আসর জমে উঠল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে, অর্থাৎ সংস্কৃতে গদ্যের অংশ ছিল অপেক্ষাকৃত কম; ধর্মনীতি, বিজ্ঞান, রাজনীতি, কৃষি, জ্যোতিষ প্রভৃতি সকলেরই বাহন ছিল ছন্দ। আর এই ছন্দের বাইরের আবরণটুকু একটু ফাঁক করলেই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সাহিত্যের নমুনা চোখে পড়ে। তার থেকেও বড় কথা হলো প্রাচীন যুগে আমাদের দেশে মুদ্রণ প্রণালী প্রচলিত ছিল না। বেদ-বেদাঙ্গ, রাজনীতি, ব্যাকরণ সাহিত্য প্রভৃতি সকলই মেধা দ্বারা স্মৃতির পাতে লিখে রাখতে হতো। আর এই প্রচেষ্টা গদ্য অপেক্ষা পদ্যেই অনেক সহজ ছিল। এই জন্য প্রাচীন প্রায় সবই পদ্যে লেখা। তাই প্রাচীন প্রবন্ধগুলিও পদ্যে। সুতরাং গদ্য বা পদ্য এখানে মুখ্য বিষয় নয়, চিন্তা-চেতনা কিংবা যুক্তি তর্কের মধ্যে দিয়ে একটি সিদ্ধান্তে যাওয়াটাই মনে হয় প্রবন্ধের বড় কথা। না হলে 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য গ্রন্থটি বিভিন্ন বিষয়াশ্রিত প্রবন্ধের একটি কোষগ্রন্থ হিসাবে উল্লেখ হত না। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য, রায় রামানন্দ ও সার্বভৌমের পারস্পরিক যুক্তি-তর্ক ও প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব প্রেমধর্মের অনন্য সুন্দর তত্ত্ব অনবদ্যভাবে তাঁর গ্রন্থে যুক্তি দিয়ে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়াটাই বড় কথা। এরকম প্রমাণ প্রচীন ও মধ্যযুগের অনেক গ্রন্থেই মেলে। অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে মানুষ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ভাবনার ভারী পোষাক খুলে যখন নিজেকে চিনতে পারলো, যুক্তি দিয়ে সব কিছু বুঝতে ও বোঝাতে পারলো তখন প্রাচীন ও মধ্য যুগের পদ্যের খোলস ত্যাগ করে পয়ার থেকে ধীরে ধীরে সংলাপের জন্ম নেয়। প্রাচীন ও মধ্য যুগে মানুষ লিখতো হয়তো পদ্যে কিন্তু মানুষের ভাবনার বাহন তো গদ্যই ছিল।

ইংরাজী Essay অর্থে প্রবন্ধের যে রূপ ও রীতি আধুনিক বাংলা গদ্যে প্রচলিত আছে, তা প্রাক্ আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যে ছিল না। 'প্রবন্ধ' নামধেয় বর্তমান সাহিত্য রূপটি প্রধানত আধুনিক কালের দান। ইংরাজী সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই বাংলা সাহিত্যে এর সূত্রপাত। কিন্তু 'প্রবন্ধ' শব্দটি অতি প্রাচীন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, মধ্যযুগের সাহিত্য ও আধুনিক যুগেও— এর প্রবন্ধ নামধেয় সাহিত্য সংরূপ চোখে পড়ে। কিন্তু প্রবন্ধ শব্দটির পাশাপাশি 'নিবন্ধ', 'সন্দর্ভ', 'প্রস্তাব', 'রচনা' শব্দগুলির মধ্যে গোলযোগ বাধে অতি সহজেই। তাই এদের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের সাদৃশ্য থাকলেও সূক্ষ্ম বৈসাদৃশ্যও চোখে পড়ে।

প্রথমে আসা যাক 'প্রবন্ধ' শব্দটির কথায়। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'

প্রবন্ধ শব্দের বিভিন্ন অর্থ দেখিয়েছেন। 'প্রকৃষ্টবন্ধন'[৭] এই অর্থ ছাড়াও 'প্রবন্ধ' অর্থে উপায়, কৌশল, চেষ্টা, আরম্ভ, প্রকার রীতি, চাতুরী, কুমন্ত্রণা প্রভৃতিও বুঝিয়েছেন। আবার এর ব্যুৎপত্তি করলে দাঁড়ায় (প্র-√বন্ধ + অ) অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বন্ধন, সমৃদ্ধ, সংযোগ, আরম্ভ। তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে কার সাথে কার সম্বন্ধ বা সংযোগ। এ প্রসঙ্গে শশিভূষণ দাশগুপ্তের কথা স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন— ''তথ্যের সহিত তথ্যের পরস্পর অন্বয় এবং পারম্পর্য, যুক্তির সহিত যুক্তির অন্বয় এবং পারম্পর্য-এবং তথ্য ও যুক্তির পরস্পর অন্বয়— এবং সকল জুড়িয়া শেষ পর্যন্ত একটি সুসঙ্গত সিদ্ধান্তে গমন— ইহাই প্রবন্ধের বিশিষ্ট লক্ষণ।''[৮]

মধ্য যুগের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থগুলিতেও বিভিন্ন প্রকার অর্থে প্রবন্ধ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন— শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কবি কঙ্কণচণ্ডী, চৈতন্যমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ণ, পদকল্পতরু, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কাশীদাসী মহাভারত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দুইটি বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ থেকে প্রবন্ধ শব্দের প্রয়োগগত বিভিন্ন অর্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'প্রবন্ধ' শব্দটির প্রাচীনতম কিংবা প্রথম প্রয়োগ চোখে পড়ে।

'এ সব কাজের আহ্মে জাণি এ প্রবন্ধ।
এতেকেঁ তোহ্মার তার হৈব নেহাবন্ধ।।'[৯]

এখানে 'প্রবন্ধ' শব্দের অর্থ 'কৌশল' বা উপায় বুঝানো হয়েছে। আবার 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' প্রবন্ধ বলতে 'আরম্ভ' ও 'পরস্পর অন্বয়যুক্ত বাক্যাবলী' এই দুই অর্থের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়—

'এই সপ্তদশ প্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ মুখবন্ধ।।'[১০]

আর একটু এগিয়ে যদি সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো যে, সংস্কৃতে গদ্যে পদ্যে উভয় রীতিতেই প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবন্ধ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বন্ধন যুক্ত রচনার পশ্চাতে ছন্দোগত বন্ধন, বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু সম্বন্ধ রূপ বন্ধন, সর্গ-পর্ব অধ্যায়াদির বন্ধন, রচনা ক্রমের ধারাবাহিক পারম্পর্য রূপ বন্ধন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বন্ধন সমন্বিত গদ্য-পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই সংস্কৃতে প্রবন্ধ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ''সংস্কৃতজ্ঞ আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণ 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'মালতী মাধব', 'রত্নাবলী' প্রভৃতি কাব্য-নাটক সকল রচনাকেই প্রবন্ধ আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ পণ্ডিত বিশ্বনাথ কবিরাজের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়—

'বর্ণরচনয়োরুদাহরিষ্যতে।
প্রবন্ধে যথা মহাভারতে শান্তঃ।
রামায়ণে করুণঃ।

মালতী মাধবরত্নাবল্যাদৌ শৃঙ্গারঃ। একমাত্র।'

সংস্কৃতে বিভিন্ন প্রকারের বন্ধননীকৃত সাহিত্যই যে কেবল মাত্র 'প্রবন্ধ' শব্দের দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে, তাহাই নহে— বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যের রচনা-সৌন্দর্য ও গ্রন্থন সৌকর্যের প্রসঙ্গেও 'প্রবন্ধ' কথাটির ব্যবহার হইয়াছে।"[১১]

''সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'মহাবাক্য' শব্দের প্রচলন চোখে পড়ে। যেমন— 'মহাভারত' মহাকাব্যগ্রন্থটি একটি মহাবাক্য। ড. অধীর দে 'সাহিত্য দর্পণ' থেকে উদাহরণ স্বরূপ দেখিয়েছেন—

'' 'প্রবন্ধে মহাবাক্যে। অনন্তরোক্ত দ্বাদশভেদোহর্থশক্ত্যুত্থঃ।

যথা মহাভারতে গৃধ্রগোমায়ু সংবাদে।' "[১২]

অর্থাৎ সংস্কৃত ও প্রাক্ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' শব্দের দ্বারা সাহিত্যের বিশেষ কোনো বিভাগের সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা পাচ্ছিনা।

এবার আমরা আসবো 'নিবন্ধ' শব্দটির কথায়। 'নিবন্ধ' শব্দটিও বন্ধন যুক্ত রচনা অর্থে প্রযুক্ত। প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রায় সমার্থকবাচক শব্দ গ্রন্থের বৃত্তি যা টীকা বিশেষ অর্থেও নিবন্ধ শব্দের লক্ষ করা যায়। শশিভূষণ দাশগুপ্তের ভাষায়— ''নিবন্ধ শব্দটি সাধারণতঃ সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থে বন্ধন যুক্ত রচনা অর্থেই গ্রহণ করা হয়; এই সাধারণ অর্থে প্রবন্ধ এবং নিবন্ধ শব্দ দুইটি অনেক ক্ষেত্রে সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'গীতশব্দরত্নাকরে' নিবন্ধ শব্দের অর্থে বলা হইয়াছে— ''নিতরাং বন্ধঃ তাললয়াদিসহিতবন্ধনং যত্র।"[১৩] বিশেষভাবে বলা যায় যে, কোন কোন স্মৃতিগ্রন্থ সম্বন্ধীয় রচনাও নিবন্ধ নামে পরিচিত।

অন্যদিকে সন্দর্ভ শব্দটির প্রকৃতি প্রত্যয় হল— (সং-সম্ +√দৃভ্ + অ) গ্রন্থন, নিবন্ধ, রচনা। সংগ্রহ, পরস্পর অন্বিত করে সাজান। অর্থাৎ সম্যকরূপে গ্রন্থন, রচন বা গ্রহণ এই অর্থেই 'সন্দর্ভ' শব্দটি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ''শব্দের সহিত শব্দের, অর্থের সহিত অর্থের এবং শব্দের সহিত অর্থের সম্যক প্রকারে গ্রথিত হওয়াকেই সন্দর্ভ বলা যায়। এই অর্থে সন্দর্ভ শব্দ প্রবন্ধ ও নিবন্ধ শব্দের অনেকখানি সমার্থক। হেমচন্দ্র সন্দর্ভ শব্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন— ''সন্দর্ভো রসনা গুম্ফঃ শ্রন্থ নং গ্রন্থ নং সমাঃ।"[১৪] অর্থাৎ প্রবন্ধ ও নিবন্ধের ন্যায় পরস্পরের গূঢ়ান্বয়ই সন্দর্ভের বৈশিষ্ট্য। যেমন জীব গোস্বামীর বিখ্যাত বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন গ্রন্থ 'ষট্ সন্দর্ভ'।

বাদ থেকে গেল 'রচনা' শব্দটি। আসলে 'রচনা' মনে হয় শিক্ষার্থী মহলে বেশি চোখে পড়ে। এবং সাহিত্যিক মহলে 'প্রবন্ধ'। 'রচনা' শব্দটি সাধারণতঃ নির্মাণ, সৃষ্টি, গঠন, গ্রন্থন, গুম্ফন, ভূষণ, স্থান, সন্নিবেশ, বিন্যাস প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গদ্য-পদ্য ময় যে কোনও সাহিত্যিক

সৃষ্টিকে রচনা বলা যাইতে পারে। 'অলঙ্কার-কৌস্তভে' কবি কর্ণপূর বলিয়াছেন— অসাধারণ চমৎকার কারিণী রচনা হি নির্মিতিঃ।'— অর্থাৎ অসাধারণ চমৎকারিণী রচনাই নির্মিতি।"[১৫] মনে হয় শব্দের সুষ্ঠু বিন্যাসই রচনা। অর্থাৎ শব্দ বিন্যাস বা শব্দ গ্রন্থন পরিপাট্য, পদ যোজনা, রীতি ইত্যাদি বিশেষ অর্থেও রচনা শব্দ প্রযোজ্য। শেষ পর্যন্ত বলা যায়—''মোটের উপরে গল্প, উপন্যাস এবং নাটক ব্যতীত গদ্যরীতিতে আর যাহা কিছু লিখিত হয় তাহাই রচনা-সাহিত্য' নামে অভিহিত।"[১৬]

এবারে আসা যাক পাশ্চাত্যের Essay-এর উৎসের খোঁজে। ইংরাজী সাহিত্যে Essay অর্থে যে বিশেষ সাহিত্যকৃতি বোঝায়-বাংলায় তার সমার্থক হিসাবে প্রবন্ধ নাম প্রচলিত। যা পূর্বেই আলোচনা করেছি। ইংরেজি Essay যেমন বিস্তৃত ও বিচিত্র, তেমনি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের পরিধিও। বিষয়বস্তু ও রচনারীতির পার্থক্য ও বৈচিত্র্য এর সংজ্ঞা নির্দেশে জটিলতা সৃষ্টি করে। ষোড়শ শতকে ফরাসি লেখক Michel de Montaigne তাঁর Essais 1580 গ্রন্থের শিরোনামে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। 'Essai' বা 'attempt', অর্থাৎ 'প্রয়াস' এই মূলগত অর্থে। Montaigne এর নির্দেশিত অর্থে ও রূপ রীতিতে ইংরেজি ভাষায় প্রথম প্রচলন করেন, ফ্রান্সিস বেকন তাঁর তিনটি সংস্করণের প্রকাশিত *Essai* (1597, 1612, 1625) এ। ষোড়শ শতকের মন্তেইন এর 'Essais' 1580 থেকে ইংরেজীতে *Essay* শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন স্কটল্যাণ্ডের ষষ্ঠ জেমস। বাংলায় 'Essay এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'প্রবন্ধ' শব্দটির চলনশীলতা সম্পর্কে পূর্বেই বিস্তৃত আলোচনা করেছি। পাশ্চাত্যে *Essay*-এর কাছাকাছি হিসাবে ব্যবহৃত শব্দগুলির হল— 'dissertation, discourse, tract বা treatise প্রভৃতি। এর মধ্যেই রয়েছে প্রবন্ধের শ্রেণি বিন্যাসের শিকড়। 'Essay' এর কাছাকাছি হিসেবে উল্লেখিত শব্দগুলি অবশ্য 'Objective Essay' তথ্যনির্ভর বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের দিকেই ইঙ্গিত দেয়। উইলিয়াম হেনরি হাড্‌সন্ (William Henry Hudsion) তাঁর *An Itroduction to the study of literature,* গ্রন্থে যা বলেছেন তা এখানে তুলে ধরা হল— 'When the so-called essay grows in bulk and comprehensiveness to the proportions, let us say, of Spencer's Essay on progress, the proper term for it is rather 'dissertation' or treatise'.[১৭]

অপর ধারাটি হল— 'Informal বা Subjective Essay (আত্মপ্রধান বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ) ইংরাজী সাহিত্যে এই ধরার রচনা 'Familiar বা Personal Essay নামে পরিচিত। এই বিষয়ে আমরা একটু পরে আলোচনায় আসবো। এ পর্যন্ত সংস্কৃত, প্রাচীন মধ্যযুগ ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রবন্ধ শব্দটি কীভাবে লুকিয়ে ছিল সে বিষয়ে আলোচনা করা হল।

এবারে আধুনিক গদ্য সাহিত্যে প্রবন্ধ শব্দটি কীভাবে ব্যবহৃত বা প্রয়োগ হয়েছে, তা

আলোচনা করে প্রবন্ধের সংজ্ঞা বা স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করব।

''আমাদের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধান এবং আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, গদ্য সাহিত্যই আমাদের গড়িয়া উঠিয়াছে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, — রচনা-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে আরও পরে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের গদ্যভাষা একটু একটু করিয়া প্রবন্ধের উপযোগী হইয়া উঠিতেছিল; তারপর হইতে সেই প্রবন্ধের ভিতর দিয়াই একটু একটু করিয়া প্রকাশ পাইতেছিল রচনার লক্ষণ; সেই ক্রমবিবর্তমান রচনা-লক্ষণগুলির উপরে আসিয়া পড়িল ইংরেজী রচনা-সাহিত্যের প্রভাব। ক্ষেত্রে উপ্ত বীজ যেমন উপর হইতে এক পশলা বৃষ্টি পাইলেই নবীন সজীবতা ধারণ করিয়া প্রচুর ফসল ফলাইতে থাকে, পাশ্চাত্য রচনা-সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের রচনা সাহিত্যও তেমনই নবীন সজীবতা লাভ করিয়া শীঘ্রই একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিল।''[১৮] এ প্রসঙ্গে আমাদের একটি বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন যে, আমরা যেকোন সাহিত্য সংরূপের কথাই বলি না কেন, তার তত্ত্বগত দিক ও ইতিহাসগত দিক কিন্তু পরস্পরের হাত ধরাধরি করেই চলে। কারণ প্রবন্ধের তত্ত্বগতদিক সব সময় বিষয় বৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল। বিষয় যেহেতু নিত্যপরিবর্তনশীল তাই প্রবন্ধের কায়াও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। সাহিত্যের যে কোনো শাখা বা সৎরূপের কথাই বলিনা কেন, তাকে যুগধর্ম ও বিষয় বৈচিত্র্যের উপরে নির্ভর করতেই হয়। না হলে প্রাচীন যুগের পদ্যের কলকল্লোল কিংবা বাঁধা ছন্দের বাইরে গদ্যের আসর বসত না। আসলে বিষয়ের বৈচিত্র্য ও জীবনের তাগিদই পদ্যের পঙ্‌ক্তি ভেঙে সংলাপের জন্ম নিয়েছিল।

সেই কথ্যভাষার সংলাপই আমাদের গদ্য। কিন্তু কি করে আসলো এই গদ্য? দেখা যাক প্রবন্ধের ইতিহাসগত দিক আমাদের কোথায় নিয়ে যায়— আনুমানিক খ্রীস্টীয় দশম শতকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হলেও সাহিত্যে বাংলা গদ্যের প্রচলন অনেক পরে। চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ধীরে ধীরে চিঠিপত্র, দলিল, দস্তাবেজ, সাম্প্রদায়িক ধর্মতত্ত্বও দর্শন ইত্যাদি বিষয় প্রসঙ্গে বাঙালির মৌখিক গদ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লিখিত রূপ নিতে শুরু করে এবং বহু রূপান্তরের পর পর্তুগীজ মিশনারীগণের প্রচেষ্টায় ছাপার হরফে মুদ্রিত হয়। *ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সম্বাদ* (১৬৭৫) ও *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ* (১৭৪৩) এ দুটি হল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বিশিষ্ট গদ্যের নিদর্শন। এতে কিছুটা লিখিত যুক্তি তথ্য সমন্বিত বিতর্কমূলক প্রবন্ধের বীজ সামান্য পরিমাণে হলেও লক্ষ্য করেছেন বিভিন্ন সমালোচক। এরপর ফোর্টউইলিয়াম কলেজের লেখকদিগের লেখনীর মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা গদ্যের গোড়া পত্তন। অন্য দিকে শ্রীরামপুর মিশনের খ্রীস্টীয় ধর্ম প্রচারক গণের উদ্যোগে ও সক্রিয় প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্য রচনার সূত্রপাত হলেও রচনা রীতির মধ্যে ছিল না সুনির্দিষ্ট

আদর্শ। এভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমাদের গদ্যভাষা একটু একটু করে প্রবন্ধের উপযোগী হয়ে উঠেছিল। এবং তার মধ্য দিয়ে রচনার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল। এরপর পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ অভিঘাত যখন ঘুমন্ত বাঙালির চোখে জলের ছিটে দিচ্ছিল তখন বাঙালি নিজের জীবনে অনুভব করেছিল নবজাগরণজাত উৎসাহ ও প্রেরণা। প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে বাঙালির এই নবজাত উৎসাহ ও প্রেরণা সময়ে ফসল বিবিধ সাহিত্য 'রূপবন্ধের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আর এইরূপ বিবিধ সাহিত্য রূপবন্ধের অন্যতম এক সংরূপ হল আধুনিক বাংলা 'প্রবন্ধ সাহিত্য'। তবে সেই গদ্যের বুকে ছুড়ি চালিয়েছেন বিভিন্ন মনীষী। তাঁদের সার্বভৌম প্রতিভার কর্মদীপ্তিতে প্রবন্ধসাহিত্য যে অমিত প্রাণ শক্তি অর্জন করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

আধুনিক বাংলা প্রবন্ধকে ড. অধীর দে পাঁচটি পর্বে ভাগ করেছেন। রামমোহন পর্ব, অক্ষয়-ঈশ্বর পর্ব, বঙ্কিমপর্ব, রবীন্দ্রপর্ব ও রবীন্দ্রোত্তর পর্ব। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন সাময়িক পত্র-পত্রিকাই যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেই প্রবন্ধ-সাহিত্যের আশ্রয়স্থল এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। বাংলা সমাচার দর্পণ ১৮১৮, সম্বাদ কৌমুদী ১৮২১, ব্রাহ্মণ সেবধি ১৮২১, তত্ত্ববোধিনী ১৮৪৩, এডুকেশন গেজেট, বঙ্গদর্শন ১৮৭২, ভ্রমর, নবজীবন, প্রচার, ভারতী, সাধনা, ভাণ্ডার, বঙ্গ-দর্শন (নবপর্যায়) অগ্রণী, ক্রান্তি, চতুষ্কোণ, ক্রান্তিকাল ইত্যাদি সাময়িক পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই পাঁচ পর্বের প্রাবন্ধিকেরা বাংলা প্রবন্ধকে কৈশোর থেকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

এই পাঁচটি পর্ব এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হল। রামমোহন পর্বে ধর্ম ও তত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত হলেও গদ্যরীতি ও ভাষার মধ্যে যথার্থ সাহিত্যরস ছিল না। কেননা রামমোহনের সময় সেই পরিবেশ ছিল না। অক্ষয়-ঈশ্বরপর্বে কিন্তু প্রবন্ধের বিষয়ে আসে নিত্যনতুন রসবৈচিত্র্য এবং প্রবন্ধের উপযোগী সংযত ও রুচিসম্মত ভাষার কারুকার্য। অর্থাৎ এই পর্বে পরিবেশটা ছিল প্রবন্ধের অনুকূলে। আর বঙ্কিম পর্বে ''বিষয়-বৈচিত্র্যেও বিষয়োপযোগী সরস রচনা ভঙ্গিতে এই সময় বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়াছে।''[১৯] অর্থাৎ রামমোহন পর্বের প্রবন্ধের কৈশোর কাটিয়ে ও অক্ষয় পর্বের পূর্ণ যৌবনের মধ্যে 'নব যৌবনের অতিমশক্তি' অর্পিত হল বঙ্কিম পর্বে। আর রবীন্দ্রপর্বে বাংলা প্রবন্ধ বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন গ্রহণ করলো। অন্যদিকে আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বসংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান প্রভাবে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা প্রবন্ধে এসেছে নানা বৈচিত্র্য। এভাবেই বাংলা প্রবন্ধে ইতিহাসের পথ ধরে বিষয়ের মধ্যে এসেছে নানা বৈচিত্র্য।

এবার দেখা যাক আধুনিক বাংলা গদ্যে প্রবন্ধ শব্দটির অর্থবৈচিত্র্য কেমন ছিল। আধুনিক বাংলা গদ্যে 'প্রবন্ধ' বলতে কেবলমাত্র বিষয় বা ভাব ঋদ্ধ মননশীল গদ্যরচনাকেই বোঝাতো।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'প্রবন্ধ' শব্দের পরিবর্তে প্রস্তাব শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই জাতীয় রচনা বোঝাতে 'প্রস্তাব' শব্দটি বেশি ব্যবহার করেছেন। আধুনিক বাংলা গদ্যে প্রথম 'প্রবন্ধ' শব্দটি ব্যবহার করেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় *বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ* (১৮৫২)। এর পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রবন্ধ' শব্দের দ্বারা বাংলা গদ্যের বর্তমান বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ হিসেবে সুচিহ্নিত। 'প্রবন্ধ' শব্দের প্রতিশব্দ রূপে প্রস্তাব, নিবন্ধ, সন্দর্ভ, রচনা চালু থাকলেও সাহিত্যিক মহলে কিন্তু প্রবন্ধ শব্দটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে আজও। বঙ্কিমচন্দ্রের *প্রবন্ধ পুস্তক*(১৮৭১), জ্যোতিরিন্দ্রনাথের *প্রবন্ধ মঞ্জুরী* রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের *নানা প্রবন্ধ* শিবনাথ শাস্ত্রীর *প্রবন্ধাবলি*, দ্বিজেন্দ্রনাথা ঠাকুর এবং রজনীকান্ত গুপ্তের *প্রবন্ধমালা*। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *সামাজিক প্রবন্ধ* ও *পারিবারিক প্রবন্ধ*— যদিও সবই Formal প্রবন্ধ।

এবার আমরা প্রবন্ধের তত্ত্বগত দিক অর্থাৎ প্রবন্ধের কায়া বা সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করবো। কিন্তু সমস্যা হল প্রবন্ধের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া মনে হয় সম্ভব নয়। কারণ বিষয় যেহেতু নিত্যপরিবর্তনশীল তাই প্রবন্ধের কায়াও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। সে কথা পূর্বেও বলা হয়েছে। তাই আমরা প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য বা উপাদানগুলির সম্পর্কে আলোচনা করে মোটামুটি একটি সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করবো। গদ্যের উন্মেষ ও বিবর্তনের ইতিহাস অনুশীলন পর্যালোচনা করলে একেবারে প্রথম থেকে এই শিল্পরূপের কয়েকটি লক্ষণ চিহ্নিত করা যায়—

গদ্যই প্রবন্ধের অন্যতম মাধ্যম ও যুক্তি-তর্ক-বিচার-বিশ্লেষণ প্রবন্ধের প্রাথমিক লক্ষ্য,

তত্ত্ব ও তথ্যের পারস্পরিক সৌন্দর্য এবং রসের পরিণতির চেয়ে সিদ্ধান্তের পরিণতিই মুখ্য বস্তু হয়ে উঠে। তথ্য প্রমাণের যথাযথ সমাবেশে, ভাবে, ভাষায়, চিন্তার প্রাখর্যে, সমন্বয়ে এবং পরিচ্ছন্নতায় প্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করা।

এসব বৈশিষ্ট্যের নিরিখেই বিভিন্ন সমালোচক প্রবন্ধের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এইভাবে—

১. ''সাধারণতঃ কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া লেখক যখন কোন ভাব বা বিষয় যুক্তি যুক্ত ও সংযতভাবে বা পরিপাটিরূপে গ্রন্থন করেন এবং প্রধানতঃ সরস গদ্যরীতিতে ও দীর্ঘ বা অনতিদীর্ঘ পরিসরে তাহার প্রকাশভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত করেন, তখনই তাহাকে প্রবন্ধ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।''[২০]

২. ''যে কোনো সংক্ষিপ্ত গদ্যরচনা যা বিষয়বস্তুকে আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপিত করে, কিংবা কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রকাশ করে কিংবা কোনো বিষয়ের অন্তর্গত বক্তব্যকে নিষ্কাশিত

করে যুক্তির মাধ্যমে পাঠককে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করে তাকেই সাধারণভাবে 'প্রবন্ধ' বলা হয়।"[২১]

৩. ''খুব কাজ চলা গোছের একটা সংজ্ঞা দিতে চাইলে আমরা বলতে পারি, প্রবন্ধ এমন এক ধরনের গদ্য রচনা যা কোনো বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থিত করে অথবা একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয় কিংবা কোনো বিতর্কিত বিষয়ে পাঠককে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে।"[২২]

৪. ''আবহমান সভ্যতার মননে সংস্কৃতির যাবতীয় দিক সংক্রান্ত যে চিন্তাভাবনা, তা যখন যথাসম্ভব বিজ্ঞান সম্মতভাবে অর্থাৎ শৃঙ্খলিত যুক্তি বিন্যাসে ধরা পড়ে বর্ণ-শব্দ-বাক্য সহযোগে, তখন সেখানেই খুঁজে পাওয়া যায় প্রবন্ধের বিচরণ ভূমি, সে বিচরণ ছন্দের তালেই হোক বা আড্ডার মেজাজেই হোক।"[২৩]

উপরিউক্ত চারটি সংজ্ঞা পাঠ করলে মোটামুটি প্রত্যেক সমালোচকের সংজ্ঞাতেই কিছু কিছু দৃষ্টিভঙ্গীর সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তা-হল কোন বিষয় বস্তুকে যুক্তির মধ্য দিয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোই প্রবন্ধের মূল কথা। আর সেটা 'ছন্দের তালেই হোক' বা ''আড্ডার মেজাজেই হোক।" ড. অধীর দে, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, হীরেন চট্টোপাধ্যায় এঁদের সকলের সংজ্ঞাতেই একটি বিষয় পরিস্কার যে, তিন জনেই গদ্যরীতির কথা বলেছেন। তাঁদের সংজ্ঞা গদ্যসাহিত্যের দিক থেকেই যুক্তিযুক্ত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেই পদ্যের ব্যবহার আগে তারপর গদ্যের। সেই দিক থেকে ড. উৎপল মণ্ডল মহাশয়ের সংজ্ঞাটি পদ্য ও গদ্য উভয় দিক থেকে সত্য। কেননা তিনি তাঁর সংজ্ঞাতে 'ছন্দ' এবং 'আড্ডার মেজাজে' শব্দটির ব্যবহার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রবন্ধের বিচরণ ভূমি গদ্য ও পদ্য উভয়ই হতে পারে। যদি সেখানে যুক্তি ও সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়ার লক্ষ থাকে। তাহলে সকলের সিদ্ধান্ত নিয়ে বলা যেতেই পারে— যুগের প্রয়োজনে সংস্কৃতির যাবতীয় দিক যখন যুগধর্ম মেনে পদ্য ও গদ্যে তত্ত্ব ও তথ্যের পারস্পরিক সৌন্দর্যের, বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যুক্তির বিন্যাসে বিশেষ কোন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ পায় এবং পাঠককে নির্দিষ্ট একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করে, তখনই তাকে প্রবন্ধ বলা যেতে পারে।

প্রবন্ধের শ্রেণী বিভাগ :

প্রবন্ধকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ক. বস্তুনিষ্ঠ, তন্ময়, আনুষ্ঠানিক প্রবন্ধ Formal, Impersonal বা Objective Essay। খ. ব্যক্তিনিষ্ঠ, মন্ময়, ভাবপ্রধান প্রবন্ধ, Personal/Familiar Essay, Subjective Essay। ক. বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় প্রবন্ধ বুদ্ধি প্রধান ও তাতে বিষয় বস্তুর প্রাধান্য থাকে। লেখক তথা বিষয়ীর ব্যক্তিত্ব সেখানে বস্তুনিষ্ঠা ও আনুষ্ঠানিকতা, জ্ঞান

ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ঔজ্জ্বল্যে আচ্ছাদিত। এখানে পাঠকও লেখকের মধ্যে কোনো হৃদয়ের সংযোগ ঘটে না। ''সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়ে কিংবা বিজ্ঞানের কোনো বিষয় নিয়ে তথ্য নির্ভর, যুক্তিগ্রাহ্য যে সব প্রবন্ধ, পর্যালোচনা ইত্যাদি লেখা হয়ে থাকে সেগুলিই বস্তুনিষ্ঠ বা আনুষ্ঠানিক প্রবন্ধের উদাহরণ।''[২৪] *বিজ্ঞানরহস্য* ১৮৮৫, *জিজ্ঞাসা* (১৯০৪), *বিচিত্র জগৎ* ১৯২০ ইত্যাদি।

বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় প্রবন্ধের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কুন্তল চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' গ্রন্থে দিয়েছেন তা সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যুক্তি নিষ্ঠা ও ভাবনার নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা, তত্ত্ব ও তথ্যের লক্ষণীয় প্রাধান্য; বস্তুনিষ্ঠা ও মননের গুরুত্ব প্রাধান্য পায় এই ধরনের প্রবন্ধে এবং প্রাবন্ধিক বৈজ্ঞানিক তথা বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেবেন, পাশাপাশি প্রবন্ধের বিষয় সম্পর্কে প্রবন্ধকারের থাকবে নিঃস্পৃহতা, নিরপেক্ষতা ও আনুষ্ঠানিক মেজাজ এবং ভাষা ব্যবহারের সতর্কতা ও সংযম। ঋজু ও গম্ভীর ভাষার মাধ্যমে প্রবন্ধের বক্তব্য প্রকাশিত হবে। পাঠকের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে প্রবন্ধকার শিক্ষক বা পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করবেন।

বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধকে ড. অধীর দে চার ভাগে ভাগ করেছেন।

ক. বিবৃত্তি মুখ্য প্রবন্ধ (Narrative Essay)

খ. বর্ণনা বা তথ্যপ্রধান প্রবন্ধ (Descriptive or Informative Essay)

গ. তত্ত্ব-বিচার বা মননাশ্রিত প্রবন্ধ (Argumentative or Reflective Essay)

ঘ. সমালোচনা বা ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ (Critical or Expository Essay)

আবার কুন্তল চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' গ্রন্থে বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের কয়েকটি উপবিভাগ চিহ্নিত করেছেন—

ক. আলোচনা/গবেষণাধর্মী সমালোচনা (সমালোচনা বা ব্যাখ্যামূলক) *লোকশিক্ষা*,

খ. বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ (বর্ণনা বা তথ্য প্রধান) *বিশ্বপরিচিয়, অব্যক্ত*

গ. ঐতিহাসিক প্রবন্ধ (বিবৃতিমূলক) *বঙ্গদেশের কৃষক*

ঘ. রাজনৈতিক প্রবন্ধ (বিবৃতিমূলক) *সাম্য, রাজা-প্রজা*,

ঙ. সামাজিক সমাজ সমস্যামূলক প্রবন্ধ, (বিবৃতিমূলক) *বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিবিষয়ক প্রস্তাব*।

চ. জীবনী মূলক প্রবন্ধ (বিবৃতিমূলক), *জীবন স্মৃতি, জীবন-যৌবন*।

ড. অধীর দের ভাষায়— ''ক. বিবৃতিমূলক প্রবন্ধ (Narrative Essay) ঃ যেমন— ঐতিহাসিক বা সমসাময়িক ঘটনা প্রসঙ্গ, খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগের জীবন-বৃত্তান্তমূলক।

খ. বর্ণনা বা তথ্যপ্রধান প্রবন্ধ (Descriptive or Informative Essay) যেমন— বিজ্ঞানের বিচিত্র বিষয়, নিসর্গ প্রসঙ্গ, রাষ্ট্র, সমাজ-সংস্কৃতি মূলক রচনা।

গ. তত্ত্ব-বিচার বা মননাশ্রিত প্রবন্ধ (Argumentative or Reflective Essay) ঃ যেমন— ধর্মীয় মতবাদ প্রসঙ্গ, দর্শন-তত্ত্বমূলক রচনা।

ঘ. সমালোচনা বা ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ (Critical or Expository Essay) ঃ যেমন— সাহিত্য প্রসঙ্গ এবং বিবিধ শিক্ষামূলক রচনা।"[২৫]

কুন্তল চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের যে ছয়টি শ্রেণীবিভাগ দেখিয়েছেন, তার মধ্যে চারটি— ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সমাজ-সমস্যা মূলক ও জীবনী মূলক প্রবন্ধগুলি ড. অধীর দে'র বিবৃতি মূলক প্রবন্ধের পর্যায়ে। অপর দুটি শ্রেণীর মধ্যে আলোচনা ও গবেষণা ধর্মী বিভাগটি অধীর দে'র সমালোচনা বা ব্যাখ্যা মূলক প্রবন্ধের পর্যায়ে এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের শ্রেণীটি অধীর দে'র বর্ণনা বা তথ্য প্রধান প্রবন্ধের পর্যায়ে পড়ে।

খ. বস্তুনিষ্ঠ, মৃন্ময়, ভাবপ্রধান প্রবন্ধ (Descriptive or Informative Essay) ঃ ইনফরর্মাল বা ফ্যামিলিয়ার, বাংলায় মন্ময় বা ভাব প্রধান প্রবন্ধে যুক্তি বিশ্লেষণের প্রাখর্য এবং মননের তীব্রতা অপেক্ষা হৃদয়াবেগই মুখ্য হয়ে উঠে এবং ভাবকল্পনার দীপ্তিতে আমাদের হৃদয়ের পিপাসা মেটায়। এই ধরণের প্রবন্ধের সঙ্গে যেন আমাদের আনন্দভোগের সম্পর্ক। বিষয় নিরপেক্ষতা নয়, বিষয়াসক্তিই লেখকের 'আত্মপ্রকাশে'র কারণ হয়ে উঠে। বিষয় এখানে উপায়, লক্ষ্য লেখক চরিত্র। লেখকের সচল সজীব, কল্পনা-ঋদ্ধ, অনুভূতি প্রবণ আত্মপ্রকাশই হচ্ছে এই জাতীয় রচনার মূল প্রকৃতি। এই জাতীয় প্রবন্ধ অনেকটা গীতিকবিতার মতো, তাই একে 'prose lyric' বা গদ্যে লেখা কবিতা বলা হয়।

''সন্ধ্যার আকাশে যেমন মেঘের নানা লীলা শুরু হয়, ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ বদল হয়, রং বদল হয়, তেমনি ব্যক্তিগত রচনাতেও লেখক মানসের নানা আলো ছায়ার ছবি আঁকা শুরু হয়ে যায়, বস্তুজগৎ ধীরে ধীরে রসের জগতে পরিণত হয়।"[২৬] আত্মচরিত, স্মৃতিচিত্র ও সাক্ষাৎকারেও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। লেখকের ব্যক্তিত্বের সৌরভ; গীতিকবির অনুরূপ এক কল্পনাপ্রবণ আত্মস্বাতন্ত্র্য যদি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সার কথা হয় তবে তেমন রচনার প্রচুর উদাহরণ ইংরেজি সাহিত্যে পাওয়া যায়। 'প্রবন্ধ' নামক শিল্পরূপটির যিনি প্রবর্তন করেছিলেন সেই ফরাসি প্রাবন্ধিক Montaigne এই আত্মসচেতন ব্যক্তিগত প্রবন্ধের রূপকার। ''ছোট ছোট ব্যক্তিগত নিবন্ধকে কেন তিনি Essay বা Attempt বলেছেন তার কারণ এ-সমস্ত ব্যক্তিগত রচনায় তিনি নতুন কিছু বলার চেষ্টা করেছিলেন' এ জন্যই এর নাম দিয়েছিলেন Essay"[২৭] অর্থাৎ মনটেইন

নিজেই যেন তাঁর প্রবন্ধের বিষয়; নিজের কথা, নিজের প্রিয়জন ও পরিচিতদের কথা, নিজের ভাবনাচিন্তা ইত্যাদি স্বগত কথনের মতো করে বলেছিলেন এক আপাত-শিথিল আন্তরিক ভাষা ও ভঙ্গীতে। ''ইংরেজিতে প্রথম ব্যক্তিগত তথা মন্ময় প্রবন্ধ লেখেন চার্লস ল্যাম্ব। তাঁর Essays of Eila-এর প্রবন্ধগুলি জীবনের ছোটো বড় সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে এক অনবদ্য হাসি-কান্নার মিশ্রণে পাঠকদের সান্নিধ্যে উপস্থিত করেছিলো।''[২৮]

ব্যক্তিগত প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ ঃ

ব্যক্তিগত প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ করাটা একটি জটিল বিষয়। কেননা, লেখকের বিভিন্ন রকমের মানসিক অবস্থা (Mood), বিচিত্র মনের চপল ক্রিয়াকলাপ বা হৃদয়ের সূক্ষ্ম গভীর অনুভূতির রূপচিত্র পরিপাটি ভাবে প্রকাশ পায়। ''সমালোচক প্রবর মোহিতলাল মজুমদার ব্যক্তিগত প্রবন্ধ 'মনঃপ্রধান ও অন্তরানুভূতি প্রধান' এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া ইহার স্বরূপ লক্ষণ অধিকতর স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। মনঃপ্রধান ব্যক্তিগত প্রবন্ধে সাধারণতঃ লেখকের বিচিত্র খেয়ালী-চিন্তা, ভাব প্রকাশের বিবিধ সুচতুর কৌশল, লঘু হাস্যরস-সৃষ্টির মাধ্যমে গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনা প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে 'বীরবল' অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ রচনা এই জাতীয় প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর প্রবন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে, ইহাতে লেখকের একটি স্বতন্ত্র মানসিক ভঙ্গি এবং ভাষার বিচিত্র কলাকৃতিই প্রধান হইয়া উঠে ভাব বা চিন্তার কোন স্থূল আবরণে পাঠক মন আচ্ছন্ন হইয়া যায় না। বরং লেখকের অভিনব মানসিক বিলাস ও প্রকাশ চাতুর্য পাঠকের নিকট অতিশয় উপভোগ্য হইয়া উঠে। ইংরাজী সাহিত্যে এডিসন (Addison), স্টিল (Steele), চেস্টারটন (Shesterton) ম্যাক্স বিয়ারবম্ (Max Beer Bohm), প্রভৃতির অধিকাংশ রচনা এই জাতীয় প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

অন্তরানুভূতিপ্রধান ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সাধারণতঃ লেখকের আত্মগত গভীর অনুভূতির অনিবার্য প্রেরণায় লিখিত হইয়া থাকে। ইহা লেখকের অন্তর বা হৃদয়ের সূক্ষ্ম ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মর্মগত বিচিত্র উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ হইয়া শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় সর্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে এবং উচ্চাঙ্গের সাহিত্যরসে ইহা প্রাণবন্ত হয়। এই জাতীয় প্রবন্ধের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে বিরল প্রায়। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কোন রচনা এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইংরাজী সাহিত্যে চার্লস্ ল্যাম্ব (Charles Lamb), ডি কুইন্সি (De Quincey), হ্যাজলিট্ (Hazlitt), স্টিভেন্সন্ (Steven Son), এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক লেখক অস্কার ওয়াইল্ডের (Oscar Wilde) অধিকাংশ রচনা এই জাতীয় প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যায়।''[২৯]

একালে ব্যক্তিগত রচনাকে অনেকে 'রম্য রচনা' (belles lettres) নামে অভিহিত করেন। কিন্তু 'বেল লেটর' অনেক দিনের ফরাসি এই অভিধায় এক ধরনের 'লঘু-রচনা' (Fine-writing) কে বোঝাতে যা সুচারু, পরিমার্জিত, স্থলিত গদ্য। 'অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় জানাথন সুইফ্‌ট কথাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন The Talter সাময়িক পত্রের একটি সংখ্যায়।"[৩০] ড. জনসন এই রম্যরচনাকে ''মনের ঢিলে ঢালা লক্ষ্মণ ("Loose Sally of the mind") বলেছেন।"[৩১] ফরাসি ভাষায় (বেল-লেতর) অর্থাৎ রস সাহিত্য। ''একে রম্য রচনা বলতে বাধা নেই। অবশ্য বস্তুগত রচনাতেও রমণীয়তা ও হৃদ্যতা সঞ্চার করা যায়।"[৩২] যেমন রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি তত্ত্ববহ প্রবন্ধ হলেও রসসিক্ত।

অনেকে রম্যরচনার সঙ্গে ছোটগল্পের সাদৃশ্য খোঁজেন। কারণ, রম্যরচনাতেও অনেক সময় একটি কাহিনী সূত্র থাকে যাকে অবলম্বন করে লেখক এগিয়ে যান। তবে ছোটগল্পের ঘন সংবদ্ধতা ও সমগ্রের ঐক্য প্রতীতি রম্য রচনার লক্ষ্য নয়। সে যাই হোক, অনেকের মতে, রম্য রচনা লেখকের সঙ্গে পাঠকের এক নিবিড় আড্ডা, নিতান্ত অপ্রয়োজনের কিছুক্ষণের সান্নিধ্য। রম্যরচনার এই প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের মতে 'বাজে কথা' এবং এই নামের একটি রচনাতেই তিনি এর প্রকৃতি স্পষ্ট করতে চেয়েছেন— ''অন্যখরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজে খেয়ালে। যেমন বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। ... বাজে কথা নিজের মত করিয়াই বলিতে হয়।"[৩৩] অনেকে আবার ভালোপত্র রচনার সাথেও রম্য রচনার সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লঘু চপল কল্পনার রঙে রঞ্জিত হলেও তাকে রম্যরচনা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, তবে কেবল মাত্র রমণীয়তার গুণেই কোনো রচনার ব্যক্তিগত প্রবন্ধের গোত্রভুক্ত হতে পারে না। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধেও রমণীয়তার ছাপ থাকা সম্ভব এবং যে কারণে তেমন কোন রচনাও রম্যরচনার অভিধা দাবি করতে পারে। তবে মাথায় রাখা দরকার যে, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে রম্যরচনার লক্ষণগুলি চর্চিত হবার সম্ভাবনা ও সুযোগ বেশি। তবে রম্য রচনাকে যে ব্যক্তিগত হতেই হবে এর কোন মানে নেই, তা বস্তুগত কোন বিষয় ও আঙ্গিকগত ভার শূন্যতার কারণে রম্যরচনা প্রবন্ধের চেয়ে বেশি উপভোগ্য, স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ ও গতিময়। বিষয়ের গম্ভীর আলোচনার থেকে মজাদার আলাপ, মজলিসি মেজাজ, রম্য রচনায় প্রকাশ পায়। ভাষার রমণীয়তা ব্যতীত মজলিসের বৈঠকিচাল কিংবা শ্রোতার সঙ্গে লেখকের খোলামেলা আলাপচারিতা কতটা আছে। কথোপকথন, নকশা, কড়চা, পত্র, জার্নাল ইত্যাদি আঙ্গিকেও রম্যরচনার স্বরূপ প্রকাশিত হতে পারে।

''Beller Lettres শব্দটি প্রথম ব্যবহার সুইফ্‌ট করলেও রম্যরচনার পথিকৃৎ বলা যেতে

পারে ফরাসী সাহিত্যিক মোতেনকে।"[৩৪] এরপর পাশ্চাত্য সাহিত্যে চার্লস ল্যাম্ব, ডি. কুইন্সি, গলস্ওয়াদি, এইচ. দি. ওয়েলস, চেস্টারটন, স্পেনডার প্রভৃতি গদ্য সাহিত্যিক রম্য রচনায় বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। অনেকে কালী প্রসন্ন সিংহের *হুতোম প্যাঁচার নক্সা* কে এই জাতীয় রচনার আখ্যা দিয়েছেন। তবে মতভেদ রয়েছে। আবার কেউ কেউ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' ভ্রমণ সাহিত্য হলেও, তাকেই প্রথম রম্যরচনা বলে স্বীকার করেন। তবে ''আমরা মনে করি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর মধ্যেই রম্যরচনার সার্থক বীজ প্রথম দেখা গিয়েছে।"[৩৫] পরবর্তী কালে সৈয়দমুজতবা আলির— *চাচা কাহিনী ও পঞ্চতন্ত্র* যাযাবরের *দৃষ্টিপাত*, বুদ্ধদেব বসুর *হঠাৎ আলোর ঝলকানি* গ্রন্থভুক্ত *ক্লাইভ স্ট্রিটে চাঁদ*, বিনয় ঘোষের *কাল পেঁচার নক্শা*, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *সুন্দর জার্নাল*, গৌরকিশোর ঘোষের *রূপদর্শীর নক্শা* রম্যরচনার স্বাদে ভরপুর। তবে বীরবল বা প্রমথ চৌধুরী সম্পূর্ণ মজলিশী ভঙ্গিতে যে সব রম্যরচনা সৃষ্টি করেছেন, সেগুলি বেশ উপভোগ্য। শেষ পর্যন্ত বলা যায় যে, সব রম্যরচনাই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, কিন্তু সব ব্যক্তিগত প্রবন্ধই রম্যরচনা নাও হতে পারে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভাষায়—

''বাংলার বর্তমান সাহিত্য সৃষ্টিতে আমি আস্থাশীল। বাংলা ভাষার লিখনশৈলী অনেক উন্নত হয়েছে। অনেকেই বেল্লেৎর (Belles lettres) বা রম্য রচনায় মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। এর চাহিদাও সুস্পষ্ট। পাঠক গোষ্ঠীর উপর সাহিত্য সৃষ্টি অনেক নির্ভর করে। সেই পাঠক গোষ্ঠী বর্তমান সংখ্যায় অধিক।"[৩৬]

যাই হোক, এবারে রম্যরচনার পাশাপাশি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রাচীন রোমান লেখক, চিন্তাশীল ও দার্শনিকেরা এমন কিছু নিবন্ধ লিখেছেন যেখানে ব্যক্তিগত স্পর্শ আছে। ''যেমন— সিসিরোর (Cicero, 106-43 B.C.) De Amicitia (বন্ধুত্ব) এবং De Senectute (বার্ধক্য) নিবন্ধ-দুটির ব্যক্তিগত সুর একালেও উপভোগ্য। প্লেটোর (Plato, 427-347 B.C.) Diologue, থিয়োফ্রাসটাসের (Theophrastus, 372-286 B.C.) Charactus, কনিষ্ঠ প্লিনির Pliny the Younger, 62-114 A.D.) Epistles বহু প্রাচীনকালে রচিত হলেও এবং তার অনেকটাই উপদেশ ও নীতিমূলক হলেও তাঁদের লেখনীতে কিছু রসের স্পর্শ ছিল। কিন্তু যাকে ব্যক্তিগত রচনা বা Subjective essays বলে তা ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে আরম্ভ হয়।"[৩৭] সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মনটেইন এরপর Francis Bacon, 1561-1626 যে Essays লেখেন তার সুর কিছু গভীর ও ভারী হলেও সেগুলি এই জাতেরই রচনা। পরবর্তীকালে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় চার্লস ল্যাম্ব (Charles Lamb, 1775-1834), কোলরিজ, (Samuel Taylor Coleridge (a772-1834), এবং একালে ম্যাক্স বীরবম (Max Beerbohm, 1872-

1956) বেলক Joseph Hiaire Belloc, 1870-1953, গ্রাহাম গ্রীন প্রভৃতি ইংরেজও মার্কিন রচনা কারেরা লীলাচ্ছলে যে সমস্ত ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, ডায়েরি, চিঠিপত্র রচনা করেছেন তাতে তাঁদের মন-মেজাজ ফুটে উঠেছে।

''বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে এই বিশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে পৌঁছালে দেখা যাবে, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ একটা বিচিত্র শাখারূপে বাঙালি লেখক ও পাঠকের মনো হরণ করেছে।''[৩৮]

বঙ্কিমচন্দ্রের *কমলাকান্তের দপ্তর* কিংবা *লোকরহস্য* এবং রবীন্দ্রনাথের *বিচিত্র প্রবন্ধ* বোধ হয় এই জাতীয় প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। পরে প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জ্যোর্তিময় রায়, বুদ্ধদেব বসু, সাম্প্রতিক বাংলা প্রাবন্ধিকদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, শিব নারায়ণ রায়, অশোকমিত্র প্রমুখ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লিখেছেন। সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা সাহিত্য উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলা প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ এখানে দেওয়া হল—

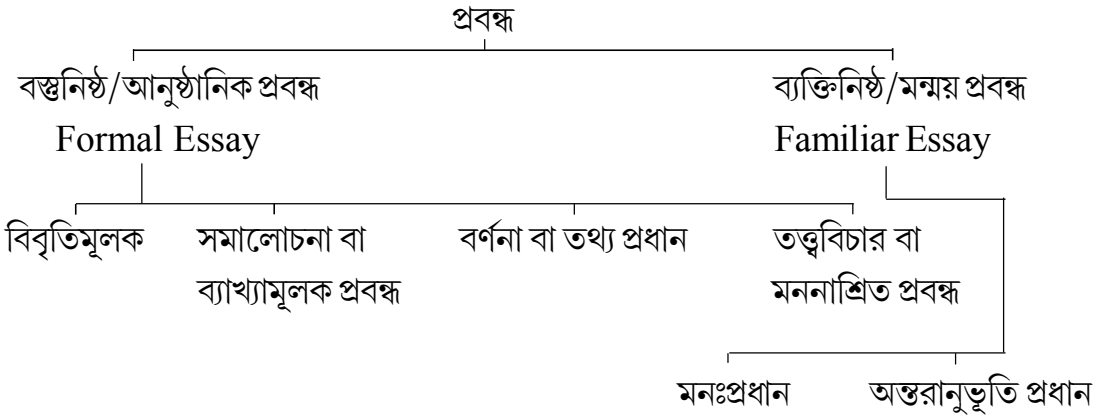

প্রবন্ধের এই প্রচলিত রেখাচিত্র অনুযায়ী অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধ কতটা প্রচলিত প্রবন্ধের মান্যতা পেয়েছে, তা আলোচনা করা যেতে পারে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধ কিংবা সাক্ষাৎকার, ভ্রমণ সাহিত্য ও চিঠিপত্র কেন প্রচলিত প্রবন্ধের মান্যতাযুক্ত, সে বিষয়ে আলোচনার পূর্বে জেনে নেওয়া প্রয়োজন তাঁর জীবন দর্শন। যেমন *আমার ছেলে বেলা, আপনকথা, হারানোদিনের কথা, জীবন স্মৃতি, জীবন-যৌবন* গ্রন্থগুলি পড়লেই বোঝা যায়— তাঁর জীবন চর্চাই জীবনবোধ গড়ে তুলেছে। কিন্তু কীভাবে গড়ে উঠল সেই জীবনবোধ? জানা যায় যে পরিবারের বৈষ্ণবীয় প্রভাব ও ওড়িয়া সংস্কৃতির মধ্যেই তাঁর বেড়ে ওঠা। খাবারের চেয়ে খবর ছিল তাঁর প্রিয়। দেশ বিদেশের খবরের সঙ্গে সবসময় তাল রেখে চলা তাঁর অভ্যাস। তাই তাঁকে জানতে হয়েছে ইতিহাস, রাজনীতি সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি সম্পর্কে। ব্যক্তি জীবনে তিনি রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও গান্ধীজির ভাবধারার পাশাপাশি সবুজপত্রের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাব ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেন। শুধু তাই নয়

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ইংরেজী উপন্যাস পাঠ, সাংবাদিকতা ও ইউরোপযাত্রার স্বপ্ন ছাড়াও ওড়িয়া, ইংরেজি ও বাংলা ভাষার জ্ঞানচর্চা তাঁকে সমৃদ্ধ করে। এর পর সিভিল সার্ভিসে যোগ। তাঁর কথায়— ''চাকরি করতে গিয়ে বিশেষত আই.সি.এস. হবার ফলে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।''[৩৯] এরপর 'পথে প্রবাসে'র মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। একে একে সৃষ্টি করেন ভিন্নধর্মী সাহিত্য। কারণ তিনি স্রষ্টা, সৃষ্টির মধ্যেই তিনি খুঁজে পান অপার্থিব আনন্দ। তাঁর সাহিত্য চেতনা দুই মহান সাহিত্য প্রবাহে লালিত। একটি ভারতীয় সাহিত্যের তিনহাজার বছরের ধারা, অন্যটি য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের পাঁচশো বছরের জোয়ার। ফলে তার প্রবন্ধে যুগধর্ম ও বিষয়ে এসেছে নানা বৈচিত্র্য। তাঁর নিজের কথায়— ''যদিও আমার প্রধান কাজ সৃষ্টি, সৃষ্টি করি আর একটুর পর একটু মুক্ত হই, তবু আমাকে কখনও কখনও সৃষ্টির কাজ সরিয়ে রেখে দেশের ও কালের ভাবনার ভাগ নিতে ও দিতে হয়। নইলে আমি হব পলায়নবাদী।''[৪০] আর এই সৃষ্টির পিছনেই রয়েছে তাঁর আনন্দ।

ফলে তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলির বিষয়ে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য। যুগধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য (আর্ট), রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, ধর্ম কী নেই তাঁর প্রবন্ধে সেইটেই প্রশ্ন। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলি কেন প্রবন্ধ— সে কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, তিনি তাঁর প্রত্যেকটি প্রবন্ধে যুক্তি-তত্ত্ব ও তথ্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে একটি সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। আর বেশিরভাগ প্রবন্ধেই যেন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। শুধু প্রবন্ধ নয়, তাঁর সাক্ষাৎকার, এমন কি সাহিত্য জীবন স্মৃতি কিংবা চিঠি পত্রগুলিও যেন কোন না কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রয়াস। কয়েকটি উহাহরণ দিলেই তাঁর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

১. ''স্টাইল বলতে আমি বুঝি প্রসাদগুণ। মাত্রাজ্ঞান। বাক্ সংক্ষেপ। লক্ষ্য ভেদ। মাধুর্য।''[৪১]

২. ''যেমন সব-লেখা আর্ট নয়, তেমনি সব গান আর্ট নয়, সব ছবি আর্ট নয়, ... দেখতে হবে কিসে মানুষ তার আপনাকে দিয়েছে, দেবার ছল পেয়েছে। কিসে দেয়নি, দেবার ছল পায়নি। সেই অনুসারে স্থির করতে হবে কোনটা আর্ট, কোনটা আর্ট নয়।''[৪২]

৩. ''ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতি যদি অন্ধদের হাতে পড়ে তবে ধর্মান্ধরা যেমন দুই ভাগ করেছে ভাষান্ধরাও তেমনি বহু ভাগ করবে।''[৪৩]

৪. ধীমান দাশগুপ্তের সাথে সাক্ষাৎকার এ অন্নদাশঙ্কর রায়ের মন্তব্য—''দেশের মানুষকে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে, নির্মাণ করতে, সৃষ্টি করতে শেখাতে হবে। পশ্চিমের সঙ্গে আধুনিকের পা মিলিয়ে নিতে হবে। পশ্চাতের সঙ্গে, ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করতে হবে। জনগণের সঙ্গে, লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। সার্থক সংস্কৃতির এই তিনটে দিক।''[৪৪]

প্রাবন্ধিক একটি চিঠিতে শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লিখেছেন—

৫. ''আপনার আদেশে শ্রী জীবেন্দ্র সিংহরায় মহাশয়ের প্রমথ চৌধুরী পড়ে দেখলুম। ... এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'আমরা দেখেছি, প্রমথ চৌধুরী মানবিকতার ভাষ্যকার নন, তিনি ভাষ্যকার নাগরিকতার। তিনি বাঙলার আপামর জন-সাধারণ নয়, নগরের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মানুষকে নিয়ে তাদেরই জন্যে সাহিত্য রচনা করেছেন।' এখানে মানবিকতা শব্দটি পরিভাষিক শব্দ। ইংরেজী হিউমানিজম শব্দের প্রতিশব্দ। হিউমানিজম কথাটির পিছনে পাঁচশ বছরের ইতিহাস রয়েছে। আগেকার দিনের ভাবুকরা ডি ভাইন-কে জীবনের কেন্দ্র করে ঘুরতেন। তার বদলে যাঁরা হিউম্যানকে জীবনের কেন্দ্র করেন, গির্জায় না গিয়ে ল্যাবরেটরীতে বা লাইব্রেরীতে যান, টেলিস্কোপ ও মাইক্রোস্কোপ বানান, থিওলজির পরিবর্তে ফিলসফি চর্চা করেন, বিশ্ববিদ্যালয় ফিলসফির চেয়ার প্রতিষ্ঠা করেন, মানুষের প্রকৃত অধ্যয়নের বিষয় যে মানুষ এই মন্তব্য প্রচার করেন ও মানব নিয়তির ধ্যানে বিভোর থাকেন তারাই হিউম্যানিস্ট ও তাঁদের মতবাদই হিউম্যাজিম। মতবাদ না বলে জীবনবেদ বলা যেতে পারে।''[৪৫]

উপরিউক্ত উদাহরণগুলি পড়ার পর মনে হয় না যে, সেগুলির মধ্যে প্রবন্ধের লক্ষণ নেই। প্রবন্ধের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই এখানে রয়েছে। তাঁর প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, চিঠিপত্র আমরা যাই পড়ি না কেন, সেখানেই রয়েছে যুক্তি, তত্ত্ব-তথ্য ও সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। তাঁর প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, চিঠিপত্র, ডাইরি, ভ্রমণ, সাহিত্য সবকিছুর মধ্যেই যেন প্রচলিত প্রবন্ধের লক্ষণগুলি স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান। এছাড়া মজার বিষয় হল, তাঁর রচিত প্রবন্ধ বা চিঠিপত্র যাঁর কথাই বলি না কেন, নামকরণের মধ্যে যেন একটি বিশেষ বিষয় লুকিয়ে থাকে। যেমন— *জীবন শিল্পী রবীন্দ্রনাথ* ১৯৩১, *গান্ধীজি* ১৯৪৬, *আমি কী বিশ্বাস করি ও করিনে* ১৯৫০, *ভাষার লড়াই-এবং* পত্রের মধ্যে *রবীন্দ্রনাথ কি ইউরোপীয়* ১৯৬১, ইত্যাদি।

তিনি সংস্কৃতির মিলনে বিশ্বাসী বিরোধের হেতুতে নয়। ভাষার সাথে সমাজের অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্ক ঠিক কোথায় কিংবা ধর্মের সাথে সংস্কৃতির যোগসূত্রই বা কোথায়, ধর্মের যে কোন বন্ধ নেই, ধর্ম যে আলো বাতাসের মতো সম্প্রসারণশীল, এসব কি যুক্তিযুক্ত বক্তব্য নয়? অবশ্যই এর পাশ্চাত্যে আছে প্রাবন্ধিকের শিল্পি মনের বৈজ্ঞানিক সাধনা। শুধু তাই নয়, মাধ্যম যাই হোক সবাইকে শিক্ষিত করা যে দরকার এটাও তিনি বুঝেছিলেন। শিল্পের সাথে শিল্পির সাধনা কেন সুন্দরের, সত্যচেতনার, ইত্যাদি বিষয়গুলিও যেন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকেই বোঝায়। এছাড়া জনগণের দারিদ্র মোচন কেনইবা কল্যাণকামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে তারও যুক্তি রয়েছে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, শিল্প ও জীবন, বিশ্বাস ও মনের পাশাপাশি ভাবের সঙ্গে ভাবনা, বস্তু জিজ্ঞাসার সাথে

রোমান্টিক চেতনা, লোকজীবনের সঙ্গে পরিশিলিত জীবন সব কিছু মিলে তাঁর শিল্প চেতনার জন্ম। কোথায় কখন, কীভাবে জাতির গঠন, উত্থান-পতন, সংস্কার হয়েছে তার যুক্তি-যুক্ত ব্যাখ্যাও হয়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক। তাঁর স্বপ্ন ভারত যেন হয়ে উঠে মহামানবের দেশ। ধীমান দাশগুপ্তের ভাষায়—

''অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধসম্ভার শুধু সহজ সামান্য কথার জটিল প্রশ্নের আলোচনাই নয়, প্রবন্ধে যুক্তি ও তর্কের সঙ্গে বুদ্ধির পাশাপাশি রসের উপস্থিতিও। একাধিক সাক্ষাৎকারে লেখক প্রবন্ধে সরসতার প্রতি তাঁর বিশেষ মনোযোগের কথা বলেছেন। সরসতা সত্ত্বেও তাঁর প্রবন্ধ রম্যরচয়িতার মেজাজে লেখা নয়, তথ্যনিষ্ঠ রচনা, বিচাকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে লেখা, মোহমুগ্ধের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নয়। এই ধরনের সৎ ও সাহসী, সরস ও স্বচ্ছন্দ রচনার জন্য দরকার দৃঢ় প্রত্যয় আর সুশোভন সৃষ্টিশীলতার। সেইটাই স্বাভাবিক কেননা অন্নদাশঙ্কর নিজেকে মুখ্যত একজন সৃষ্টিশীল ও রসিক শিল্পী বলেই মানেন। তাঁর জীবনদর্শন মোটের উপর একজন শিল্পীরই জীবনদর্শন। যে শিল্পীর বহির্জীবনের চেয়ে অন্তর্জীবনই বেশি সক্রিয়। যার নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপোড়া সমস্তক্ষণ চলেছে, যেমন বিশ্বের সঙ্গে বোঝাপড়াও। নিজেকে স্বাধীন ও সৃষ্টিশীল লেখকরূপে পরিচয় দিতেই তাঁর গর্ব, না, কালচারাল ওয়ার্কার এই পরিচয়ে নয়। ওয়ার্কার হতে তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু কালচারাল ওয়ার্কার হতে আপত্তি। তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য ওয়ার্কম্যানস ক্র্যাফ্‌ট নয়, তিনি ক্রিয়েটিভ রাইটার এবং এই ক্রিয়েটিভটিরই এক ক্রিটিক্যাল রূপ তাঁর প্রবন্ধসাহিত্য।

একদিক থেকে দেখলে প্রবন্ধসাহিত্যই অন্নদাশঙ্করের ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ— তাঁর চেহারা ও মানসিকতার মতোই নির্মেদ, সরস, তীক্ষ্ণ ও ঋজু। তাঁর প্রবন্ধ একই সঙ্গে সামাজিক ও সাহিত্যিক, সমসাময়িক ও যুগোত্তীর্ণ, সাবজেকটিভ ও অবজেকটিভ, সাহসী ও মরমী, স্বজ্ঞাযুক্ত ও যুক্তিপূর্ণ, লেখকের খণ্ডশ মুদ্রিত প্রবন্ধ সমগ্রে তারই প্রকাশ।''[৪৬]

''অন্নদাশঙ্কর রায় নিজে তাঁর প্রবন্ধগুলিকে মূলত দুটিভাগে ভাগ করেছেন— ক. সমস্যামূলক, খ. সাহিত্য বিষয়ক। সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের একটা বড় অংশ সাহিত্যগুরুদের নিয়ে লেখা।''[৪৭]

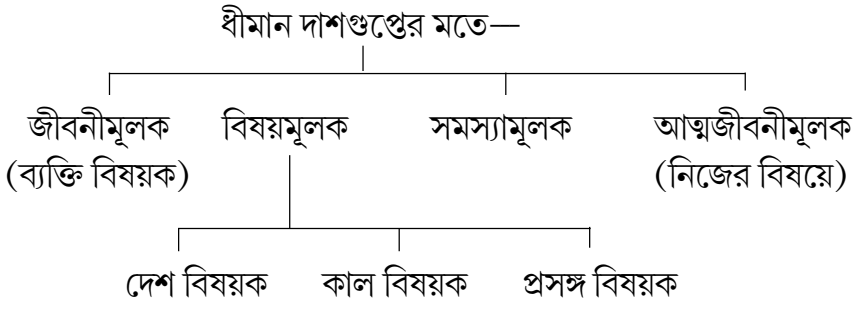

আমাদের মতে প্রচলিত প্রবন্ধের শ্রেণী অনুযায়ী অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধের শ্রেণী বিভাগ—

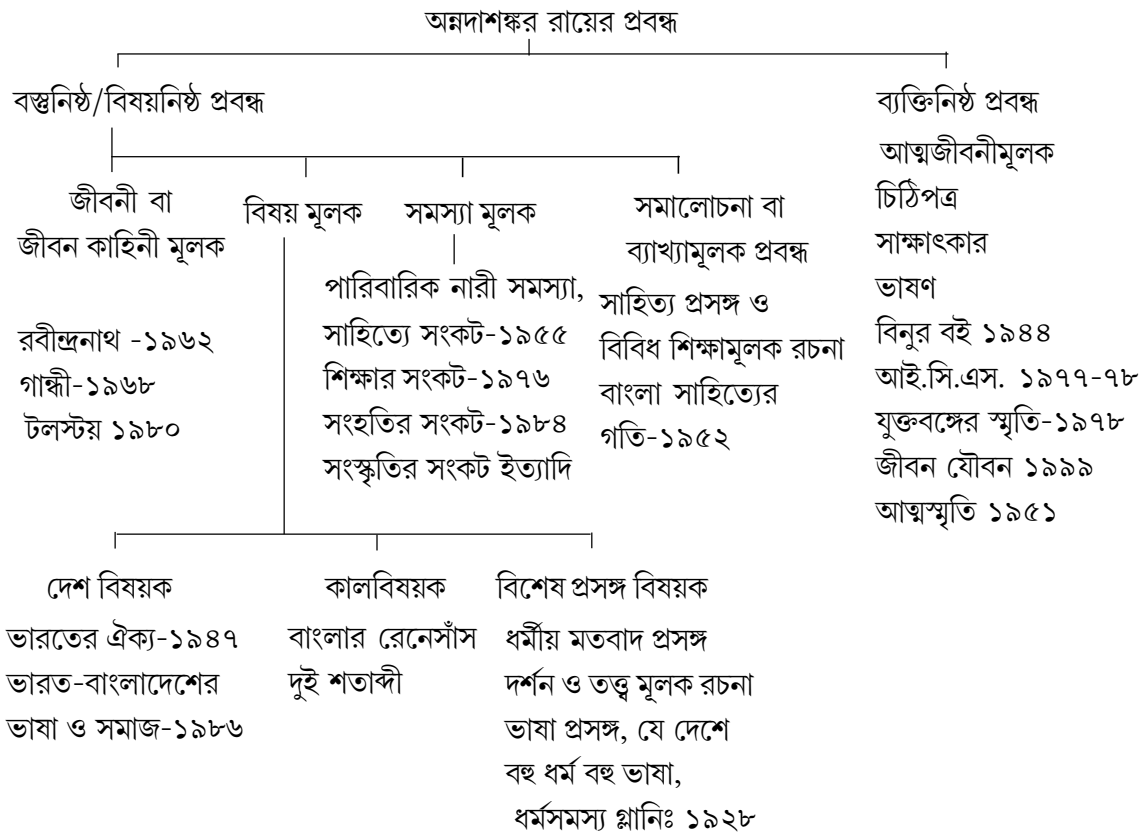

তথ্যসূত্র:

১. হালদার গোপাল - সংস্কৃতির রূপান্তর, প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম প্রকাশ ১৩৪৮, সংস্করণ, ১১৩

২. ঠাকুর শ্রীরবীন্দ্রনাথ - রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৩৯, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪০২, পৃ. ৫৩১

৩. মণ্ডল উৎপল, মোদক রীতা সম্পাদিত- বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ চর্যা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, পৃ. ১১

৪. ঐ - পৃ. ১১

৫. ঠাকুর শ্রীরবীন্দ্রনাথ - রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৯৫, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১৭, পৃ. ২৩৬-২৩৭

৬. ঐ - পৃ. ২৩৭

৭. বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ - বঙ্গীয় শব্দকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০০৪, ১৩৪০, পৃ. ১৩৯০

৮. দাশগুপ্ত শশিভূষণ - বাঙলা-সাহিত্যের একদিক, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৫১, ষষ্ঠ বইমেলা সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ২০

৯. ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন - বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৭৩, জুলাই ১৯৬৬, দশম সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১১, অক্টোবর ২০০৪, পৃ. ১৯২

১০. সেন সুকুমার সম্পাদিত - কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০১২,পৃ. ৩৮

১১. দে ড. অধীর - আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, প্রথম প্রকাশ শারদীয়া ১৪০৮, পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ৪

১২. ঐ - পৃ. ৪

১৩. দাশগুপ্ত শশিভূষণ - বাংলা-সাহিত্যের একদিক, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ়, ১৩৫১, ষষ্ঠ বইমেলা সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৩, পৃ. ২০

১৪. ঐ - পৃ. ২০

১৫. ঐ - পৃ. ২১

১৬. ঐ - পৃ. ৯

১৭. দে ড. অধীর - আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, প্রথম প্রকাশ শারদীয়া ১৪০৮, পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ৩

১৮. দাশগুপ্ত শশিভূষণ - বাংলা-সাহিত্যের একদিক, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ়, ১৩৫১, ষষ্ঠ বইমেলা সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৩, পৃ. ৪৪-৪৫

১৯. দে ড. অধীর - আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, প্রথম প্রকাশ শারদীয়া ১৪০৮, পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ১৩

২০. ঐ - পৃ. ৩

২১. মজুমদার উজ্জ্বল কুমার, - পৃ. ২১৮

২২. চট্টোপাধ্যায় হীরেন - সাহিত্য প্রকরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, পঁচিশে বৈশাখ, ১৪১২, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা ১৪১৩, পৃ. ২৭৪

২৩. মণ্ডল উৎপল, মোদক রীতা সম্পাদিত- বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধচর্যা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০১৪, পৃ. ১৪

২৪. চট্টোপাধ্যায় কুন্তল - সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪০২, আগস্ট ১৯৯৫, পঞ্চম মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪১৫, পৃ. ২৯০

২৫. দে ড. অধীর - আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, প্রথম প্রকাশ শারদীয়া ১৪০৮, পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ৮, ৯

২৬. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার - সমালোচনার কথা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দ, কার্তিক ১৮৮১ শকাব্দ, পুনর্মুদ্রণ ২০১১-১২, পৃ. ২৮১

২৭. ঐ - পৃ. ২৮১

২৮. চট্টোপাধ্যায় কুন্তল, - সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪০২, আগস্ট ১৯৯৫, পঞ্চম মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪১৫, পৃ. ৩১৩

২৯. দে ড. অধীর - আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, প্রথম প্রকাশ শারদীয়া ১৪০৮, পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ১০

৩০. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার - পৃ. ৩১৩

৩১. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার - সমালোচনার কথা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দ, কার্তিক ১৮৮১ শকাব্দ, পুনর্মুদ্রণ ২০১১-১২, পৃ. ২৮২

৩২. ঐ - পৃ. ২৮৩

৩৩. ঠাকুর শ্রীরবীন্দ্রনাথ - রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, চৈত্র ১৩৯৩, পৃ. ৬৮৪

৩৪. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার - পৃ. ২২১

৩৫. চট্টোপাধ্যায় হীরেন - সাহিত্য প্রকরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, পঁচিশে বৈশাখ, ১৪১২, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা ১৪১৩, পৃ. ২২১

৩৬. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৪৯

৩৭. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার - সমালোচনার কথা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দ, কার্তিক ১৮৮১ শকাব্দ, পুনর্মুদ্রণ ২০১১-১২, পৃ.২৮১

৩৮. ঐ - পৃ. ২৮৩

৩৯. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০৬, পৃ. ৪৯০

৪০. ঐ - পৃ. ৪৮৫

৪১. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ২৫

৪২. ঐ - পৃ. ৩৮১

৪৩. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৫, পৃ. ২৯০

৪৪. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০৬, পৃ. ৪৮৫

৪৫. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০০, পৃ. ৭৬

৪৬. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০৬, পৃ. ১৫

৪৭. ঐ - পৃ. ৯